

পাণ্ডিত্যশাহী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

১৫৫

এক টাকা আট আনা

অষ্টম সংস্করণ

পাণ্ডিত্যশাহী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুজ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বালা-ইতিহাসটা এতই বিস্তীর্ণ যে, যখন সে সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত গিশিয়া হইতে থাকে। যখন সে ছুবছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা গিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে স্ত্রী দেখিয়া, বড়ালগ্রামের অবতাপন্ন গৌরদাস অধিকারী, তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে দ্বিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। সেও বাগ বিরা কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু দুই মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ, কোন গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না; কুজও না। তাহার মা কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায়। কণ্ঠী-বদল জাপানটা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ জানে না। ক্রিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের মাতৃবৎসরকেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে তাহার বালা-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী—তাহার

দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্ণপটুতা, আবার তে পড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি, তাহাকে বে-মা দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহ ব্রহ্মসও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্র করিতে চাহে। সে কুসুমকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চা এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ ভরি রূপার অলঙ্কার দি স্বীকৃত। দুঃখী কুসুমাধ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কু সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কানেও তোলে না। কেন তা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটী বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতে কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হরপণ্ডিত পাঠশালা পড়িয়াছে, খেলাধুলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তা সঙ্গী-সাথী। তাই এই সব প্রসঙ্গেও, তাহার সর্বদা দ্বণায় লজ্জা শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বি হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্য-সখীদের অনেকেই, তাহার ম হাতের নোয়া ও সিঁথীর দিল্লুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফির আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর-গঙ্গাজল, কেহ সেই মহাপ্রসঙ্গ ছি, ছি, দাঁদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহাদের ত গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুসুম কহিল, দিদি, রাজী হ। ধমুতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আর্দল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝি তো দাদা; ও বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেরাল পেতেছে যে, বা-ইছে

মে পরিচ্ছেদ

তাই করবে! এই বিয়ে, এই কঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার বদল; যাও, ওসব আমার স্নমুখে তুলো না। বাড়লের উনি আমার ঈ নয়; আমার স্বামী মরেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা জমিনী ভগিনীটির স্নমুখে, সে কেমন যেন খতনত খাইয়া যায়। তথাপি ম ভাবে, আর এক রকম করিয়া। সে বড় দুঃখী; এই দুখানি কুটির তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁটালের বাগান ছাড়া আর হার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত ছোড়া-চোড়ার, তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও এই প্রলোভন ছাও, সে তাহার একমাত্র স্নেহে সামগ্রীকে এই ভাল কাপড়টিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে দুখী দেখিয়া, নিঃশেষ দুখী হইতে চাহে।

কঠী-বদল তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহার মা-কাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী, যখন এত দাবাসাধি করিতেছে, তখন কেন যে কুসুম এত বড় স্নবেগের প্রতি দৃকপাত করিতেছে না, তাহা সে কোন মতেই ভাবিয়া পার না! শুধু সমাজের ফৌজদার ও ছুড়িদারের মত লুইয়া, কিছু মালদা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরাণী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামার ঘুন্সি, মালা, চিকরী, কোটা, সিন্দূর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য,

তাদি মাথার নইয়া পাচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায় সমস্ত দিন ফিরি করিয়া যাহা পাও, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম, মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না; পারিবার চেঁচাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল পরে বুন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে বাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিয়া; হাত-পা ধুইতে ভাল দিন এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া বাতির করিল। ছি-প্রভরে তাহার নানাবিধ কাজের দ্বারা, কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া রাখা করাইলেন এবং এত রোজে কিছুতেই ছাড়িয়া দিগেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হা-পা বুঝিয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে, সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষ করিল ই, একটা গেরস্ত বাটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন কোনটি আভাস সেই—মা লক্ষ্মী যেন উৎসে পড়ছেন!

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কাঁহল না।

কুঞ্জ ইহাকে স্থলমগ্ন মনে করিয়া, বুন্দাবনের মা কি রাখিয়াছিলেন এবং কিরূপে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সাবশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রকমের বেকলে মাথ ধরো কতক হবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি স্থানিয়া কহিল, তা হ'লে দাদা বুঝি মারাদিন এই ক'রই ক'রেচ? খেয়েচ আর গুনিয়েচ?

তাহার দামাও সন্ধ্যায়ে যাবার দিন, কি করি বল বোন! ছেড়ে না দিলেও ত আর জোর করে আসতে পারি নে?

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুসুম কহিল, তা হ'লে ও গাঁয়ে আর কোনো দিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, বাব না? কেন?

পথে দেখা হ'লেই ত ধরে নিয়ে যাবে? তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু আমাদের তা হ'লে ত চলবে না দাদা।

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুব্ধ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলি নি দাদা— সে কথা বলি নি; দু-এক দিনে আর কি লোকসান হবে! তা নব; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশি নেশামিশি ক'রে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত ঘোঁড়ী-কী-নি কুসুম!

তা যাও নি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাওয়ার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিস্ তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস্ কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া, হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলে-বেলা থেকেই খেলা করি; তা ছাড়া তারা আমাদের স্নাতক ও ময়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা মিলাদা।

কুঞ্জ থানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা গঙ্গী তাঁদের দরাস করেছেন, ছুপস্যা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহংকার নেই—সবাই বেন মাজীর মানুষ! বুদাবনের মা আমার হাত ছুটি ধ'রে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আবার সেই সব পুরোণো কথা উঠল ! মায়ের নামে ওরা এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাড়া বৃষ্টি ভুলে বসে আছি !

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলে নি। বা লোকে হিংসে করে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন ?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বোচাঙ্গীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম আর দুই চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশ বার সেই সব কথা তুলে ? আমি পারি নে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুটস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস নে ; কিন্তু আমাদের যে সব দিক্ দেখতে হয় ! আজ আমি মনে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস্ ?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গভীর মুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুকব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, তোর শাউড়ী নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্য্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুসী হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস্ ?

কুসুমের মুখের জাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বই কি ! বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার ভগ্ন-বদনের কথা লইয়া, তাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে—এ সম্বন্ধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া

তুলিল; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি
থাবে দাদা ?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারি করিয়া বলিল,
কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সত্বর কণিয়া নিজের
ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা
নিঃশেষ করিয়া হাঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল,
কুসুম!

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে দিলাই করিতে বসিয়াছিল—সাজা দিল,
কেন ?

বলি, রান্দির হ'চ্ছে না? রাঁধবি কখন?

কুসুম সেগুন হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধব না।

কেন? তাই জিজ্ঞেস করি।

কুসুম চোঁচাইয়া বলিল, আমি একশ বার বক্তে পারি নে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ ভূম্ ভূম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে
আসিয়া দাঁড়াইল। চোঁচাইয়া বলিল, জালাতন করিস্ নে কুনি! অমন
ধারা করলে যেখানে দুচোখ যায় চলে যাব তা বলে দিচ্ছি।

যাও—একুণি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ি-ডোমের মত অমন
করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে
যত পার চোঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ারমুখী, তুই ছোট বোন হয়ে
বড় ভাইকে তাড়িয়ে দিস্ ?

কুসুম বলিল, দিই। বড় বলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে নাকি?

বোনের মুখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করুন শুনি ?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে ?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে ?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েছে ? ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা করে দিছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড় ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড় বোন যে, আমাকে হুকুম করবি ? আমার ইচ্ছে জলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না, বলে দিছি দাদা !

এবার কুঞ্জ বসার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই ?

কুসুম সিলান্নি ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিত না বলছি দাদা—বাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর ছইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সন্ত্রাস যাব ? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই ?

কুসুম জবাব দিল না ; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জল করিয়া দিয়া সিলান্নি করিতে বলিল। আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর হৃদয় বাড়িল, গর্ভবৎ অশ্রুসিক্ত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথার বলে 'যত্নবায় মলে'। নিজে রাগদোষ মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই ; কিন্তু আমি একটু গোঁরে কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল ; কিন্তু ঘরের ভিতর

হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হাঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-তাই টান দিয়া গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড় আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা চালিয়া ফেলিয়া নুতন করিয়া মাজিতে মাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল, চাই নে আমি কারো কথা! একশ বার না-না শুনে আমি চাই নে! আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই, বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া বাড়ি বাঁকাইয়াই শুরু হইয়া থাকিল।

কুহুম নিঃশব্দে আনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; বাবুল, ব'সে ব'সে কৌদল করবে, না যাবে এখান থেকে?

ছোট বোনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্রুখে বড় ভাইয়ের কর্তা মাজিয়ার সখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুহুম তেমনি ভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুজনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁ চিঁ কবিয়া বলিল, বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্ছি।

কুহুম হাত বাড়াইয়া, দাঁও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে, কিরিয় আসিয়া, সেটা হাঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আকরাবেরু দোকানে যাচ্ছ ত?

কুজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুহুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশি রাত কর না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুজ হাঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে দিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অভ্যক্তি মাত্র করে নাই। সতাই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উত্থাইয়া পড়িতেছিল; অথচ সে জন্ত কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলে-বেলায় নিজের চেষ্টায় বাঙলা লেখা পড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গোরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এই সব অনাস্থ্য কার্যে পুত্রকে প্ররম্ব দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইহাকে সে নিজের ইংরেজী শিক্ষার জন্ত নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামের কেহই জানিতে পারে, নাই—বেন্দা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিব্রোহের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত; সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত এবং দুপুর-বেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্ত পীড়াপীড়ি করিলে, সে তাহার শিশু পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্ত বিয়ে করা তা আমাদের আশা; আর আবশ্যক নেই না।

না কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ এক দিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির স্নমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-কক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল; সে তখন সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিতে; স্মৃতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিতে।

এক সন্ধান হইলে মাতাপুত্রে যে সন্ধন হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সন্ধন ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদের যে ক্ষেত্র আছে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা হোক না, তবু সে তোমার বৌ। এখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাব নি কেন?

মা বলিলেন, সে সব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন—ক'রে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা! আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি; আমার বিয়ের জন্ত আর তুমি পীড়াপীড়ি ক'র না। বলিয়া সে অন্তত চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী, কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্ত, অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই—কুসুমকে কোন মতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির ছোটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ—সে তাহার নিরীহ, অসমর্থ ও অল্প-বুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্থিতি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ—পুকেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া

না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয় ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে থাকিয়া দাঁড়াইত না; কিন্তু ঐ যে আবার কি সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্যজীবনের বিস্তৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেষ্টামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কোতুহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে ঊকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ি-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল। ছি ছি, এ সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে এক ভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট—এ কথা সে মনে ঠাই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দূকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে বলিয়াছিল যে, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে, নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামটি নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্যাকার ক্রটি সারিয়া লইবার জন্যই সে যে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম বাহা অগ্রমান করিল, তাহা নহে—সে ক্রটি আঁ একটা; খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যাষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর

দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দান্নার জন্ত রাধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া, ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা আস্থিকে বসিত। যে দিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সে দিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মল্লিকা ও যুঁই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্য-পূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সবে মাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময়ে সদরে কয়েকখানা গোবান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষণেই একটি প্রোতা নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইহাকে আর কখনও দেখে নাই; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, যেই হন, স্বজাতি।

প্রোতা কাছে আসিয়া, হাদিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা; তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কই?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরিতে বোধ করি, দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো! কাল যে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগ্নে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই, আজ সকালে বল্লুম, বৃন্দাবন, গুরুর গাড়ীটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে

সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রশ্ন করিয়া উঠিয়া গেল এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইল। কুসুম বুঝিল ইনি শান্তি। তিনি আসনে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়া দাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাসা করে বললে—আমি এমনই হতভাগা যে, কুঞ্জদা, বড় ভাইএর মত হয়েও, কোনো দিন ডেকে এক ঘটা জল পর্যন্ত খেতে বললেন না। কদিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাস্তে হাস্তে ভাই সকলকে নেমন্ত্রণ করে এল—তারা সবাই এল বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তার বুদ্ধি-শক্তি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি খেন একটা গোলমাল ঘটয়াছে। সন্দেহ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বোমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যায় নি!

কুসুম ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। ভাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তারপর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া স্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেরা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিন্তে টিন্তে গেছে, এক্ষণি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির। কুঞ্জদা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটে ছেলে—ইহারাই মানাত ভাই। তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বোমা ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্চি পেতে দাঁও বাছা—ওরা বসুক।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কঞ্চল পাতিয়া দিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে, রান্নাবরে চলিয়া গেল।

বুলাবন লেখিতে পাইয়া সহাস্তে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাই নে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাবরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূৰ্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যস্তাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিষ বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে! আজ সকালে স্বানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাতে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোট বোনকে কুঞ্জ বখাৰ্হই এত ভয় করিত যে, সচরাচর নাক্ষুষ ছুট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘুরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, কোঁকের মাথা—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস, কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারেন নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সব চেয়ে বিপদ এই হইয়াছিল যে, সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পরসো নাই।

এখন নিরুপায় ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্যোধ নির্যাহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এই সব পরিহাস করিল! উনি কে যে, দাদা তাঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া থাওয়াইবে?

এই দিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কত দিন মকাল সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর স্তম্ভের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃখ অবহার কথা সে সমস্ত জানে; জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল স্থপ্তি করিয়াছে।

কুহুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন এণা সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছোঁলদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তার ছেলের চোখ, ঘরের বাহিরে দুরিয়া খেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুহুমের উপরে পড়িল। চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সক্ষেত তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃদপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই, দ্বিগ হইল। সে বুকিল, ইচ্ছা চোখের ভুল; ইচ্ছা অদস্তব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মাছর মুখ ঢাকিয়া কতপক্ষে প্রহান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার ক সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাঁচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইলই পারে না। বৃন্দাবন অচ দিকে চোখ ফিরাইয়া গেল।

কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাছিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

দ্রুতপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকুছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনিই মৃদুকণ্ঠে বলিল, হঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, ভারি চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে, আনাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে?

ঠাৎ এক অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকন্তর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি করে দিন চলে? কেন ভবে তুমি দানাকে এমন তামাসা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এসে?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশি বিচলিত হয় না। পানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে স্যাঁতলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জরা কোথায়?

কুসুম বলিল, জান নে। আমাকে কোন্ কদা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে বেতে দেবার কিছু নেই না কি?

বিছু না; সব ছুরিয়েছে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কছিল, এ গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিছি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি, একেবারে নান করে ফিরে আসব। যা জিজ্ঞাস্ করলে বল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুসুমদার তুমি কোন এও, তাই সে পালাতে পেরেচে, আর কিছু হলে বোধ করি, এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশি পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কখাটা তাহাকে বাতবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন বাইবার জন্ত পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয় ত একদিন ভাদতেও পারে। ছেলে-বেলায় তোমার নাথের অস্তায়ের জন্ত যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্ত তেমনই আমার বোধ নাই। যাক এসব কলঙ্কার এখন সময় নয়, যাও—রাখবার বোমাড় কর, গে।

বৃন্দাবন কি বোমাড় করব শুনি? আমার মাথায় কেটে রেঁধে দিল যদি তোমার পেট ভরে, মা ভয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ কথাই জবাব না দিয়া কষ্টের আরও মত কঠিনা ধীরে ধীরে বলিল, আমার যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আনাকে তা নষ্টতেই হবে, কিন্তু রাগের দায় তোমার শাস্তিষ্টাৎকরণকে বেন কিছু কথা শুনিতে দিও না। তিনি অল্পেই বড়

শাস্তিষ্টাৎকরণ

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশি তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা দান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা আহ্বিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আগে সেই ঘোগাড়টা করে দাও গে। আমি চললাম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি করে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্ছে। আর এক দিনের আশা দাও ত আজ না হয় শিগ্গির করে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে। বলিয়া কুসুম রামাধরের ভিতরে ঘাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য্য! একবার মনে হ'ল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাদের তুমি এমন শাসন করে এসেছ—ভগবানের তাতে বাধা কি আশ্চর্য্য বাধন কুসুম!

কুসুম দাঁড়াইয়া গুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্কশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রামাধরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বাসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, যাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্মুখে এক নূতন জ্ঞানে নূতন তথ্যের উৎস্বক হইয়া উঠিল।

ভূতীয় পরিচ্ছেদ

সে দিন সন্ধ্যার পূর্বে বাটী কিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্যাকণ্ঠে বলিলেন, যৌনা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটানুম, তা মুখে বলতে পারি নে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে এক জোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নিৰ্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইচ্ছাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় জাঁক দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় ঢুকিয়া বহিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-বধূতে এ সময়ে আর কোন কথা হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আনার কাছে পাতিয়ে দিও!

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাড়িতে গৌর-বিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নান্না জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ইহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রণামের ছায়া পড়িয়াছিল। এই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে গোরুর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া কিছু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মাথার উপর

তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা ?

মা সম্মুখে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু বস্।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন সময় কোনো দিন সে ঠাকুর প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল; যে আশাতীত মৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাই নম্র স্বদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বলিত বেগাদ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার এই এক ফোঁটা বংশবরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক পা নড়তে পারি নে, তাই আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে খেন্ ভারী বোঝা নামিয়ে নিয়েচে। তাকে শিগ্গির ঘরে আন বোঝা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই—দিন-কতক কাশী বৃন্দাবন করে বেড়াই।

...

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্তে কহিল, সে আসবে কেন মা ?

মা নিঃসন্দেহ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি ! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে বাই নি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা ছুগাছি পরিষে,

দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যে দিন একটা ভাল দিন পাব, সেই দিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনবে।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটাকে দেখবে ত ?

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈকি ! সে ভয় আমার নাই।

কেন নেই মা ?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন ! অবস্থা খাটি কিনা, এখন বলতে পারি নে, কিন্তু পেতল নয়, গিল্টি নয়, এ কথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার সংসারে তাঁকে আনুগার কথা তুলতুম না ?—হাঁরে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা কয় ?

কোন দিন নয় মা ! তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই, বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা ! তার দোষ নেই ; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনাতর জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায় নি, তোকেই—নিয়তে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়া-শুদ্ধ নৈমহন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তারপর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, গুলুম, বৌমাকে সে ভারি ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারি মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার যো নেই—তা বয়সে বড়ই হ'ক আর ছোটই হ'ক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে তার দিলে তার সহিতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখন বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেছি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—সারা সন্ধ্যা-বেলাটা কেবল মনে হয়েছে, বতস্বর্গে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কণ্ঠে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে মা ?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আমার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুমি গোপালকে গাড়ী আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গার ঘাট ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুভেতেও মন্দ নয়, তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া এই এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা ?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সব চেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কাল, কিন্তু মুখশ্রী আছে। বাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিন-রুণ দেখাই গে মা ! তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে কি হবে না, সে নিশ্চয় জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেবা-পাণ্ডনার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাত্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চণ্ডীঘণ্ডের সন্মুখে, গারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নাম্তা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর-গাড়ী সন্মুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ী হইতে নামিয়া টেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেজ্ঞাস্ত্র পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাহার প্রবল মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা ?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আর—অনেক কথা আছে; বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তার নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নার গৃহীণপণ্য কুতুমকে সন্তান সত্যি ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে বর-সংসার ন্যাসিয়া দিয়া তাঁর ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন—এই সব সুখস্বপ্নের কাছে, আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার শ্রমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালার ছুটি দিয়া ভিতরে আনিয়া দৌখল, সে দিকের কোন উজোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আনাকেই সব ভার বহিতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে—কিছুতেই রাজী হ'তে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সংস্র বৎসর পরমাণু হোক বাবা, তোমারই কথাই হচ্ছেল, এস ব'স। হঠাৎ এ সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামাত্তর হইতে পথের বাড়ি আসার এটা সময় নাক।

কুঞ্জনাথ বাড়ি টুকিয়াই এ বকমের সংজ্ঞা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল। তারপর অপ্রতিভ ভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্নাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জনা, টের পেল কি করে? রাতটাতাক চুপ করে থাকতে পারলে না, বাহর ফাল সকালে এসেই জ্ঞতে?

মা একটু হাসিলেন, কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপু রে! বোন নয় ত, যেন দাওগো।

বৃন্দাবন বাড়ি ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা দুখ টিপিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েছেন বুঝি?

কুঞ্জ সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বসিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি বকম ভুল? ধব. কুপ্‌সেব চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হ'লে কি সর্কনাশ হ'ত বল ত?

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া দ্রবং উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রছিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা ?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হাক্কা করিতে চাহিল না ; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে বল কি ধাওয়াবে, তবে বল।

মা এবার হাসিলেন ; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল ?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছ, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েছে আগে বল ?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া, সন্দ্বিগ্নস্বরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি।

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল ; পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া এক ছোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তাহলে এটা তোমাদের নয় বল ? বলিয়া মহা আতলাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরম মেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধুর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নিরোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া, মাথের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে এক কৌটা রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট নাই। অপরাহ্নের স্নান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পূর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের মুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিম্নে সামলাইয়া বহিয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বসিল, মা, আমার

বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে সে পরে? কুঞ্জনা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই মহা আফ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ ছপুর-বেলা, তাহার খাওয়া দাওয়ার পরে যখন কুঞ্জম রান মুখে বালা জোড়াটা হাতে করিয়া আনিয়া শুক মুহু কণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেল রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে; তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লগ্ন্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘোর-পাঁচ সে বৃষ্টিতে পাবেন না, তাহার বোনের কথা মতা নয়, মাগুব মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিল আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—কিরাইয়া নেয়, এ সব অসম্ভব কাণ্ড, তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া, তাঁহারা কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন—এই সব।

কিন্তু কৈ, সে রকম ত কিছু হইল না? যাগ হইল, তাহা ভাল কি মন্দ সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এত বড় একটা কাজ করিয়াও মারের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্বাদ না পাইয়া তাহার মন ভারী হারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন, তাহার সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অতৃপ্তি তাহাকে ক্রমশঃ ঢাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষম মুখে চুপ করিয়া বহিল, তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহি না। বাক্য-লাপ করিবার অংগ তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন

অপমানের আঁগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—
নায়েব।

নিজের ভাল মন্দ, মন অপমান আর ছিল না। হৃত্যু-যাতনা যেমন
আর সর্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননী
অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনই করিয়া তাহার সমস্ত অতৃপ্তি
গ্রাস করিয়া, একটী মাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল,
বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আব একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল;
ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কজনাই এক নিমেষে
ভূমিসং হইয়া গেল। এখন কি উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—
কাছে গিয়া কোন্ সাহসের কথা উচ্চারণ করিবে।

আবার সব চেয়ে নিষ্ঠুর পরিণাম এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত
নির্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত, সন্ন্যাসিনী মাঝে তখন করিয়া
আঘাত করিতে পারিল—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে।

শত্রুতম পরিচেষ্টক

কাল একটি দিনের মেঘা-মেশায় বুসুম তাহার শান্তভী ও স্বামীকে
যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে ঠিক তেমন চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে
তাঁহাঃ দেশমাত্র সংশয় ছিল না।

বাঁধারা চিনিতে জ্ঞানেন, তাঁহাদের কাছে এমন কারখানাকে সাগরদিন
ধরা দিতে পাইয়া শুধু অতৃপ্ত আননে সদয় তাহার ক্ষীত হইয়া উঠে নাই,
নিজেই অগোচরে একটা দুঃস্থের মতো বকনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বাধন আজ আপনাকে মৃত হিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। জোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল এবং নিবাস কুজলাশ মুহা উঠানে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্তের জন্য সেই গত-কালিকার অসহ্য দোষ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন 'চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক অস্বাভাবিক হইয়া বাজিবে এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া যাইবে।

সন্ধ্যা বলক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুজ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের স্তম্ভে আসিয়া ভিজ্রামা করিল, কুসি, আলো জালিসনে রে ?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা! কখন এলে ?

এই ত আস্টি, বলিয়া কুজ সন্ধান করিয়া ছঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনও প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব সেই সব প্রস্তুত করিয়া আলো জালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লক্ষ্য দালা চলিয়া গিয়াছে।

প্রাতদিনের মত আজ রাত্রিতে ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুজ গন্তীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। সে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সঙ্গী আজ এত বড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পারিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটনাছে, অতএব কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কি এবং কতদূরে গিয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, দাদাকে

তাহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোট-খাটো অপমান তাহার দান ধরিতে পারে না, এবং পারিলেও এতরূপ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুহুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বৃহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তা'লে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা ? কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে—মার-হাতে দিয়ে এলুম। কি বললেন তিনি ?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাণ্ডীঠাকরুণ কি এক রকম যেন হয়ে গেছে কুহুম। এমন জিনিষ হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুলী হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে ! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিষ আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ও কি রে ?

কুহুমের গৌবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে নাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ কথা তিনি বললেন ?

হাঁ, সে-ই বল্লে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি—এমন করে আমার পানে চেঁচুে, বইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম, তা যেন বুঝতে পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিঃশব্দ মনে বার-তুই বাড় নাড়িয়া থামা মাথার লটয়া বাহির হইয়া গেল।

দিন-চারি দিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বনরা কুঞ্জ পরন্তু ও কাল মত ভাব করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এই মাত্র ভাই-বোনে তুলতুল বলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে বায়, ও পুড়ে বায়, আজকাল মন ভোর বোধায় থাকে কুসী ?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, জ্বাশি কারো কেনা দাসী নই—পারব না রাধতে—যে ভাল রেখে দেবে তাকে আনো গে ।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না । হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দূর হ, তখন আনি কি না দেখিস । বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল ।

দে দিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এত বড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না ।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাবরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল ।

কোন্ বোধ করি তখন দশটা, বন্টা-খানেক কাঁদিয়া কাটিয়া আস্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া ‘কুঞ্জদা, কুঞ্জদা,’ করিয়া ডাকিতেছে । তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়কের একটি জটপুষ্ট সুন্দর শিশু । কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্র-পথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ।

এ যে তাহারি স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিয়া মনে চিনিতে পারিয়াছিল । চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু খন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাক্ষা দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্তির মত একভাবে পলক-বিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল ।

আজ সকালে নিজের কাষে সে এই দিকে আসিয়াছিল এবং কাষ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গো-যান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র চরণ পূর্বাভূই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি ?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, বাবার সময় নদীতে বাস।

সে বেচারী শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সে দিন কুস্তম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছনে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাস লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে-বোধ করি, কোন মতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার এক মুহূর্ত্ত দিশা করিল, তারপর একখানি কুস্ত আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ার পাতিয়া দিয়া কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার জুড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এ দিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একে ত এটা সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোট মাঝিয়া কোন দিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুস্তম ঘরের ভিতর হইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ

নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবল বেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝড় ঝড় করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছি বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোন মতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বৃষ্টি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সম্মান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড় অসম্বিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে বতই নিজের বুকের উপর অমুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তবিত শত-হৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অত্যাচার করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি, নদীতেই জল খাইত। এই মেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি, অনেক সুদহ হইতে পারিত। কখিল, ছেড়ে দাও!

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, না বল, তা হলে ছেড়ে দেব।

চরণ ষাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হলে, ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে হাপাইয়া তুলিয়া বলিল, না না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

চরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, না।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুম্মের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বকে চাপিয়া ধরিয়া কঁাদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাটীর হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল থাওয়া হ'ল রে চরণ ?

চরণ কঁাদিয়া বলিল, ছেড়ে দেয় না যে।

কুম্ম চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে পাক।

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন ?

তা ছাড়া এখনও থায় নি, না বড় ব্যস্ত হবেন।

কুম্ম তেমনি ভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন ?

কুম্ম সে কথার উত্তর দিল না।

অনেকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ী ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েছে, আমি নদী থেকে চরণকে হান করিয়ে আনি। বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গাম্ছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নিচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, ভাস দেখিয়া চরণ খুসী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাকে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। বাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল এবং উপর হইতে ইঁটু-জলেশ লইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া বান সাঁ। কোলে ছাড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলম্বন নজর হইয়া গিয়াছে।

হেলে কোলে করিয়া কুম্ম স্নান করিতে আসিল। দুখ তাহার সম্পূর্ণ অমাবৃত। নাথার ঝাঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। বাইবার সময়

সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাস-নাও সে মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সন্ত-বিক্রান্ত গোলাপের মত গুঁটাধর চাপা-হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সজোচ বা কুণ্ডা একবারে নাই, সহজভাবে কহিল, এবার তুমি বাও, মান করে এল।

তার পরে ?

• থাকে।

তার পরে ?

থেকে একটু সুমোবে।

তার পরে ?

বাও, আমি জানি নে। এই গান্ধী দাও—আর দেরি বা'র না। বলিয়া সে সত্যজ্ঞে গান্ধীজী স্বামীর মাথার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গান্ধীজী দ্বিতীয় ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা ভাঙা দীর্ঘখাল অলক্ষ্যে ঘোঁচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি ফিলপ করে না। চরণকে যা হোক ছুটী দাও—আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন ? গাড়ী ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

সিক সেই জাহুই গাড়ী ফিরে যায় নি, একটু আগে গাছতলার দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুমুমের হাসি-মুখ ম্লিন হইয়া গেল। শুধুমুখে নগকাল দ্বির থাকিয়া, মুখ তুলিয়া বলিল, তা হলে আমি বলি, মায়ের অন্তে এখনো তোমার আসাই উচিত হয় নি।

তাহার গুঁড় অভিনয়ের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজ ভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েছি কুমুম, যে, মায়ের অন্তে এ-বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারকুম না। বাক্য শেষ হয়ে গেছে, সে

কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও, আর দেরি ক'রো না, ওকে থাইয়ে দাও গে। বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলেলইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে পিতা-পুত্রে গাড়ী চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল,

তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তোমার মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়া কহিল, হাঁ, আমার মা—ই ত হয়—হয় না?

বৃন্দাবন ও-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস
তোমার মার কাছে?

চরণ খুসি হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ীর একধারে শুইয়া পড়িল
এবং রোদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ন-বেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সন্দের দরজায়
শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে ওদিকে
চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়ল থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন, বলিয়া সে মলিন
উত্তরীদের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরায় রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উপর
তাহারই নাম—খুনিয়া মৌনিল, অনেক লেখা—বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্নত-আগ্রহ সে প্রাণপণে
দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি
পণ্ডিতমশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?

ছেলেটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালায় কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন ?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিতমশাই।

তার কাছে তুমি পড় !

আমি পড়ি পাঠশালা আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিতমশাই নিজেই বই, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের-বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া বেরে ফিরিয়া যায়। দুই জন বয়স্ক ছাত্র, পাঠশালা ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাঙ্গা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাবণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্বাদ পর্য্যন্ত নাই। অথচ এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ। আশাগোড়া কাষের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এ কথা বলিতেই সে কাল আঁসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সন্তক স্থির করিয়াছেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেন না, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুটিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর একবার পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু এবার সমস্ত অক্ষরগুলো তাহার চোখের সমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিত্তিখান বন্ধ করিয়া কেনিরা কোন মতে বসে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিম্ব পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাধ-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও অল্প হইয়াছে বনিয়াদ অল্পপণ্ডিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আদিরাছিলেন, কারণ দুঃস্বপ্নতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয় দিন ছিল। মনের মতন নূতনমা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে কিরিয়া ফাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া শুইয়া বাওয়া হইয়াছিল। সেই অংশি কুজমের জীবন দুর্ভাগ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিশেষ ন্য হইতেই সে যে সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাষ্ট এখন অক্ষরে অক্ষরে কনিয়ার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভাল মতেই চিনিতে, ঠিক বুঝিয়াছিল দাদা শাওড়ীর পৰামর্শে এই ভাষ-বষ্টের সংসার ছাড়িয়া ধর্ম-জানাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাষ্ট হইয়াছিল। বে মাথাখ টোপের পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথাখ আর থামা বহিতে চাছিল না। নদভাঙার লোক বলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা ঢালা বঁধিয়া, সে মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিল। এক

পর্যন্ত বিক্রা হইল না। অথচ এই এক মাসের মধ্যেই সে নূতন জন্ম কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার স্বস্তরবাড়ি বাতারাৎ করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারি ভয় ভেঁত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বলে, না হা কোথায় সরিষা বায়—সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম শ্রমণ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলাইল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং শিষায়। লোক জুটিতে স্বস্তরবাড়ির গল্প, এবং নূতন বিয়া-আনাগের ফর্দ তৈয়ার করে।

সে দিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বাশিশ-করা জুতার তেল মাখাইতে চক্কে করিতেছিল, কুসুম রান্নাবর হইতে বাহিরে আসিয়া দলপা চাহিয়া কহিল, আবার আজও নদজাডায় যাবে বুঝি?

হঁ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কান করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মূকপটে কহিল, সেখানে এই ত সোদিন গিরেখি-দাঁদ। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটো খবর পাই নি, বড় মন ব্যাথাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উদ্যত হইয়া কহিল, তোর সব তাঁতেই মন ব্যাথাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সহ্য করিয়া বলিল, তামাই থাক তবু একবার দেখে এলো গে, স্বস্তরবাড়ি কাল বেড়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল—কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটা পুরুষমানুষ পর্যন্ত নেই। ঘর-বাড়ি বিঘর-আশর কি হচ্ছে, না হচ্ছে—সভার আমার নাথায়—আমি একা-দাতব্য কত দিক সাম্ভাব বস্তু?

দাদার কথার ভিত্তিতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া কৌলিল, হাদিরে

হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি বাও—কি জানি কেন, সত্যিই তার জন্তে বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুদ্ধস্বরে কহিল, আমি পালব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসে নি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে, একবার আসতে পারলে না, শুনি?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্ত ভাবে বলিল, তাঁর জর হয়েছিল।

হয় নি। নলডাণ্ডায় বসে না খবর শুনে বললেন, মিছে কথা; চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাণ্ড নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে বাজার খবর দিতে পারেন, তা জানিস্? নেমক্‌হারাম আর কাকে বলে, একেই আমি তার মুখ দেখতেও চাই নে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীর ভাবে কুসুম দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাঘাতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত তরুণী থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমক্‌হারাম তিনি! মুন তাঁকে সেই দিন বেশি করে খাইয়েছিলে, যে দিন ভোকে এনে, ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন স্তব্ধ হইয়া পাইল না, এই রকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বল্চ, সে কার হাতে? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে পর? মা বললেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না! বিয়ে আপনি হয়!

আপনি হয়?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘবে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘুণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এ সব কথা যদি তাঁরা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচ্ মচ্ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না? লজ্জা হয় না?

কেন, এখানে কি বাব ভালুক আছে তোকে খেয়ে ফেলবে? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শব্দরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া অনন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অমৃতপ্ত দুঃস্বপ্নকারী নিকপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তিক্ত তেমন মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর-ঘরের কায কর্তেও পারবে—হুকুম দেবে ত

মা ? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জনমীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল ।

মা এবার বুঝিলেন যে কারণ স্বভাবি ভিন্ন এ বয়ে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না । কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুমি সত্যি বল্‌চিস্ বৃন্দাবন ?

সত্যি বই কি মা । ছেলে-বেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান । কিন্তু বড় হয়ে তোমার সাম্মান্যে কখন ত মিথ্যে বলি নি মা ।

অচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাঁধে মন দিলেন ।

বৃন্দাবন হৃদয়ে আসিয়া বসিল—সে হবে না মা । তোমাকে আমি তার তে মন দেব না । বা দোক একটা ছকুম নিয়ে এ ঘর থেকে আর কোন বাল্য এসেছি, ছকুম নিয়েই যাব ।

কেন ভাবতে মনষ দিবি নে ?

তার কারণ আছে মা । তুমি ভেবে চিন্তে বা বল্‌বে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের ছকুম হবে না । আমি জাহান্নাম প্রবেশ চাই নে—শুধু অস্তিত্ব চাই ।

মা মুখ তুলিয়া ফণকাল চাহিয়া থাকিয়া বসিলেন, কিন্তু এক দিন যখন অস্তিত্ব নিয়েছিলুম, মাথা-মাথা করেছিলুম, তখন ত তুমি নি বৃন্দাবন ?

তা জানি । সেই পাপের দলই এখন চারাতক থেকে ঘিরে বেবেছে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল ।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই ঘরী করিবার জন্য এই পাপ টপাপন করিয়াছে এবং ইহা কাঁধে পরিণত করিতে তাহারই পো রূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল । তিনি সংক্ষেপে করিলেন, এখন থাক বৃন্দাবন, ছুদিন পরে বল ।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া করিল, যে কারণে ইতস্ততঃ করচ মা, তা ছুদিন

গরও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেছে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি
কমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারি নে মা, আমাকে
অহুমতি দাও, আমি একটু জ্ব্ব হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, অহুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্দ্য বুন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না।
নিশ্বাসে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ে ধুলা মাথায়া লইয়া ঘরের বাহিরে
আসিয়া দাঁড়াইল।

পণ্ডিতদশাই, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালার এক ছাত্র আসিয়া
একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বুন্দাবন?

জানি নে মা, দেখি, বলিয়া বুন্দাবন অহুমতের মত নিজের ঘরে চলিয়া
গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি
নাই, বর্ণাঙ্কুর নাই, উপরে শ্রীচরণকমলে পুষ্প লেখা আছে, কিন্তু নিচে
দখল নাই। কুহুমের হস্তাক্ষর সে পূর্বে না দেখিলেও, তৎক্ষণাৎ
বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিন্তিতে পারিবে
না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে
বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও
গুরুবাড়ি গেলেন। হয় ত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন,
কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ ভালুক নাই, একা পাইয়া আমাকে
কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত ব্যস্ত যদি
না থাকে, আমার চরণকে দিয়া বাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুহুম উঠানে চল চাহিয়া

দিয়াছিল, আর তাহা জলে নাই। সারা দিন অভূক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্র বার ঘর বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জন নিস্তর্র বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতা গিয়া এমনি সময়ে বাহিরে চরণের স্তূতীক্ল কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জল-মগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আশা দিদির পরে কুসুমাত্মের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কঠেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি না, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়াই বুঝিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েছি বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ বে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে শুক হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যে দিন বিগ্রহের তিনি একবিন্দু জল পর্যন্ত না খাইয়া

চরণকে নইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, কিন্তু অন্তর্গামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিলেও তাহার শিরীর রক্ত কি ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাজে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাঁহার সে দিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যে দিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের চিনিয় তাহাদিগকেই প্রত্যাপণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত ব্যাকি রাখে নাই! বারংবার প্রত্যাত্থান করিয়াছে, তাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। ফণকালের নিমিত্ত সে বোন-মতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্ফতি তাঁহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে মহাক্রম সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহ মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল; কেন একি আমার নিজের হাতে গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি বাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, জন্মের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের ছোটো কুসংসারিক কথাবার্তার, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র এবং দুর্গম সেবার

এত ভালবাসা আদিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—তখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জন্যই আত্মহারা হইয়া এই ছুরণের কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নেন নেন বলিল, মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধমপাজী, তবে কেন তিনি আমার এই অজ্ঞায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই।

হঠাৎ তাহার নক্ষত্রীয় শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষমণ্ডল চরণের তল্লা ভাঙিয়া গেল—কি না?

কুহুম তাহাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশি ভাল বাসিস্ বন্ ত চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ ভৎসনায় জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হাঁ, দেব।

তোমার বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?

হাঁ দেব।

কোন অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে যোঝে নাই, ... শু কোনো সময়েতেই নুতনমাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুহুমের চোখ দিয়া কঁোটা কঁোটা জল করিয়া পাড়িতে লাগিল। চরণ

ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি ! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই !

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, একটি প্রোচা নারী প্রাঙ্গণের নাকখানে দাঁড়াইয়া নানাধি প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সর্বিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাস্ত্রী। শুধু কৌতূহলবশে জামাতার কুটীর-খানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোন দিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কিনা।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিন্ধবসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলো চুলের রাশি সমস্ত পিঠব্যাপিয়া জাহ্নব স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বাম কক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাস্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি ?

কুঞ্জ খুসী হইয়া কহিল, হাঁ না, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকান, তাই কুসুম সেইখানেই বড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রশ্ন করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সম্মুখে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি, বাবা, বলতে নেই! মামিমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাণ্ডী বলিলেন, বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? এক ফোটা ছোড়ার কথা দেখ!

দাক্ষণ বিষয়ে কুসুমের হাসি-মুখ এক মুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্ৰিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, বড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুজ নির্বোধ হইলেও শাণ্ডীর এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কানে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাণ্ডীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স, চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরণে খান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাঁজু—নিজের শাণ্ডীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্মুখে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশি খান। সকাল হইতে স্নান করিয়া সারাদিনটাই সেটা ঘন ঘন চলিতে লাগিল। রান্নাঘরে তিলক-

সেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই ছুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আশিটি পর্য্যন্ত তুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্য পূজা সারিয়া রাঁতিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কই গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেল-সেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করি নে।

করি নে, বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্য্যন্ত খাবে না বে!

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তা হলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত।

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাওড়ী কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত?

কুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে না?

মা গাঙ্গৌর্য্যের সহিত বলিলেন, আমার আর চারটে চোখ কান আছে। তা সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাইটি করলে তবু তোমার বোন রাজী হ'ল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত! পাড়ায় পাঁচ জন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার বোনের এই সোমন্ত বয়স, এমন

কাঁচা-দোনার রঙ—লোকে বলে, মন না মতি, পা কদম্বান্তে, মা টল্‌তে
কতক্ষণ বাছা ?

কুঞ্জ সায় লিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা ।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ক্রকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে
বসে কি কচ দাদা ! উঠে যাও ।

কুঞ্জ খতনত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ হইয়া
বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা ?
এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজ্ঞে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও
লেখলে মূনির মন টলে কিনা, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি ?

কুসুম চোঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ভুনো না—যাও এখান থেকে ।

তাহার চীৎকার ও চোখ মুখ দেখিয়া কুঞ্জ শব্দব্যস্তে উঠিয়া পলাইল ।
কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা হুন্ করিয়া নিচে নামাইয়া দিয়া
ক্ষতপথে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন । তাঁহার সমকক্ষ
কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা ; এই সহায়-সম্বল-হীন
মেয়েটা, তাঁহাকে যে হতভয় করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি
অপ্রেমও ভাবেন নাই ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন, তাহা না বুঝিলেও সে দিন দাদার শাশুড়ী যে বাদ-সঙ্কল্প
করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না । তা
ছাড়া তাহার কথার সম্ভ্রট ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন এক
সময়ে প্রমোদজুক থাকে সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গুঢ় কারণে যায় নাই ।

যেই প্রথমটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, কল্যাণ
নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই
কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া
ঘর হইতে চুলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কায হয় নাই, ইহা সে
নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ী সে দিন সারাদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক
সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাটমানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মানরক্ষার
জন্ত কুঞ্জ সমস্ত দিন ভগিনীকে ভৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু প্রাণারাগি,
মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই।
পরদিন বাটা ফিরিবার পূর্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া
দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ী কথা কহেন নাই। এবং জানাইকে উপলক্ষ্য
করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে,
এখানে বোন আগলে বসে থাকলেই ত তার চলবে না।

কুসুমের দিক হইতে এ কথার জবাব ছিল না; তাই সে নিরন্তর
অধোমুখে শুনিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা-এদিক ওদিক ছুদিক
সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুসুমকে
তাঁহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই
সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না।
কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত,
সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি
লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি, তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত
না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না। কলহ করিতে
কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সে দিন এক রাত্রি

বাকিতে একা বাকিতে সে ভয়ে বাঁকুল হইয়া উঠিয়াছিল, একা একা বাকিতে
 একা বাকিতে হয়। অবস্থা দুখে পড়িয়া তাহার ভরও ভাঙিয়াছে

তথাপি এসব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার
 গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বাঁধে। রহিয়া
 রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও বোধ করি, দাদা একবার
 কাদিবে না—এক হোটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার
 এই নিষ্ঠুর ক্রটি সে তখন নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে
 ঘরে ঘোর দিয়া বসে, আর সে দিন ঘোর খোলে না। হৃদয় বড়
 ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সেই মা, মা,
 করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে এক দিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে
 একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে,
 তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম
 পথ চাহিয়া রহিল, তাহা ত আসিলই না, দুছত্র কাগজে-লেখা জবাবও
 আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া,
 মুহূর্তমক্কে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিহিয়া বাইবার জন্ত
 প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে, কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল
 কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ
 কি যে হইল, নূহ কঠে বলিয়া বসিল, এফগি যাবে দাদা? আমা রাগ্না
 শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না?

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, বা ভেবেচি তাই।
 অমনি পেছ ভেকে বস্দি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ

মুখ বিকৃতিত তাহার সর্বদাঙ্গ আঁতন ধরিয়া গেল, সে পাণ্টা মুখ-বিকৃতি করিয়া না বটে কিন্তু অতি কঠোর স্বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে আজ পর্যন্ত বচ পেছু ডেকেচি, মাছুষ হলে মরে যেতে।

আমি মাছুষ নই ?

না। কুকুর-বেরালও নও—তারাও তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেনক্কারাম নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মুচের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘটা-খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কুঞ্জর বর তাল-বন্ধ, কুসুমের বর ভিতর হইতে বন্ধ—রাগাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আগার পরিত্যাগ করিয়া কেঁউ করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রাগা হইয়াছে, কতক বাকি আছে—উদান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, স্মরণাৎ কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে ত্রু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিঃশব্দে আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ভাকে কুসুম দৌ খুঁটিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্বাঙ্গেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল, জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া, একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জাহ্নু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুষন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণমায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিল, মা কঁাদে না বা।
 'বুন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল।' জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?
 ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; জবাব দিতে পারিল না।

বুন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম রুদ্ধ স্বরে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল? কি হয়েছিল?

তাহার গম্ভীর স্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া অলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ, তামাসা করে না। দেহ আমার জলে পুড়ে যাচ্ছে, এখনও সব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কি এমন করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কঁাদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কন্ঠ্য বুন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে বেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারি গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাষেও এদিকে আস্তে যেতে, এখন ভুলেও আর এ পথ মাড়াও না।

বুন্দাবন কহিল, ভুলতে পারি নি বলেই মাড়াই নে, প... হয় ত মাড়াতুম। যাক, কি কথা?

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বুন্দাবন হাসিল। তারপরে শাস্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিই নি, ভাল

ভাবাই জানতে চাচ্ছি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, বেশ ত, তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করব বলে আমি অনেক দিন অপেক্ষা করে আছি—আমি চুল এলো করে, পথে ঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই এই কথাটা রটিয়েছিল ?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ফণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে ?

তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলি নি, মনেও ভাবি নি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে দিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জল্প করবার ভুলেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে পেরেছি আর আজ পারি নে ? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড় নি !

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েছে ! তখন তোমাকে আমি চিন্তে পারি নি।

এখন পেরেচ ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়ি-কুড়ি রান্না-বান্না সমস্ত যে মেয়ে দিয়ে গেল !

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, ষাক্ গে। আমি ত খাবো না—আগে জানলে রাখতেই যেতুম না।

আজ একাদশী বুঝি ?

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানি নে। ও সব আমি করি নে।

কর না ?

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিকন্তর হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধবশে বলিল, আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্তাক্ত হইয়া কহিল, করি নে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করে দে-চায় না সেই জন্তে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হ'ল, কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা করো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হ'ল কেন?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত—তোমাকে শোনাবার আমার বেধা নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না—তার শাওড়ীর লুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হতো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি না, তারপর বলিল, এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন, এক দণ্ডও এখানে আর থাকতে চাই নে।

বৃন্দাবন সহাস্তে প্রশ্ন করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই?

কুসুম একটবার চোখ তুলিয়াই মুখ নিচু করিল। এই সহজ, সহাস্ত প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে কি কোঁথায় থাকতে চাও তুমি?

কুসুম তেমনি নতমুখেই বলিল, কি করে জানব? তাঁরই জানেন।

তাঁরা কে?—আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারি নে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে, থাক না কেন, চরণের হাত ধরে বাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেন। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলেছি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি করে আমি দিনের-বেলা পায়ে হেঁটে দিঙ্কুরের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানি নে, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাই নে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুসী তোমার।

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে মিহিত অর্থ বা কিছুনা অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সে উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাই নে, কেন না, নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হ'ল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মন্ত অপমান হ'তো না। যাক

চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সইসা চরণকে কোঁচি হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম। আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হ'ল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলাম না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আরণ্যকিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বন্দাবন ফুঁক ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করি নি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্দশি হয়েছিল, মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে আমার মা, স্বামী, পুত্র, বরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্য্যন্ত গুরুবাড়ির মুখ দেখতে পাই নি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে বাড়ির বো। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের-বেলা সমস্ত লোকের সমুখ দিয়ে গায়ে ছেঁটে পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাও নি! কেন পাও নি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুইটিকে মালুষ করেছিলেন, দাদা উজ্জ্বলিত করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশি কথা কি! এ শুধু তোমার মন্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প! আমি বরং এইখানে না থেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হা পোতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মাল-মশলা খুসিয়ে দেব না।

বন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই বলবার নেই।

কুসুম তেমনি ভাবে জবাব দিল—বাও। দাঁড়াও, আর একটা

কথা। - দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিহ্মনা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে ? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করি—

কুসুম-তাই-এক পা গিয়াছিল, কিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাং দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন ? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি। তাহার অর্দ্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মূহু অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল, তা ছাড়া পরের চলা-ফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিত নয়। তোমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাই নে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করি নে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের জায় নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না ?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে কোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা-

কিরিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণশয় বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ, সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাহার বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ও-দিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেই অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দাদার সেই একই ভাব—সর্ব-বন্ধমেই প্রাণ যেন কুসুমের

বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাণ্ড বাটীর বাহির হওয়া, কিংবা পূর্বের স্থায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। ত্রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া এমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনব্যত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল শ্রুতের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া বাহিত। এই সমস্ত মহৎগুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সে-ই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্ন-বেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের শ্রুত তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যে দিন তাঁহার সন্মিলনে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামি-সম্ভাবণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার এখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্থিতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াহলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিনা ‘চিনাকি’ অনিচ্ছনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দুঃখের সেই বাদ প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তারপরে

নবম পরিচ্ছেদ

রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামি-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাওড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্ত সেই অবশিষ্ট শুদ্ধ নীতল, যা হোক কিছু।

তাঁহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীদেহ ধরিয়া কার্পাসের অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না; কামনাও করিত না। তাঁহার মনে হইত, যাহারা এ কার্য নিত্য করিতে পায়, এ সংসারে বুকি তাহাদের আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাঁহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষ দিনের কথা। যে দিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সে দিন সে নিজেও বাঁধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ মুহূর্ত্তে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতে ছিল, ওই ভয়ই তাহার বৃকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যই যদি সে না আসে, তবে একদণ্ডও সে কীভাবে কি করিয়া? আবার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেশ তাঁহার মনের মধ্যে পুর্বে ছিল, যাহা এ দুদিনে হয় ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস আগিয়া উঠিয়া অহনিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করিতেছে সমস্ত মিথ্যা! তাঁহার ছেলে-বেলায় কলঙ্ক ছনীম কিছু সত্য নয়। সে হিঁদুর মেয়ে অতএব যাহা পাপ, যাহা অশ্রায়, তাহা কোন মতেই তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভাল-বাসিতে পারে না। তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাষে লাগিবার জন্ত সমস্ত দেহ মন এমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান

নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এই জ্ঞাত সদর দরজা খোলা ছিল, হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু-চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিষয় ও জীবা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুজলুবিত রাঙা চোখ লজ্জায় ভুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সমুখে আসিয়া কহিল, তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচে রে!

কুসুমের বক্ষঃ-স্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুনীরের সঙ্গে বাদ করে, কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারীতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দা বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আশুন লাগিয়ে দেব; সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাঁস্তান মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাজ।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন ঘটিয়ে কহে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আফালন করিয়া কছিল, বেশ ? কখন না আমার বোনের মত দেখতে ? হুৎ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিন্ ?

ভূতো জবাব দিবার পূর্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের স্রুখে আসিয়া বলিল, কার কুসি, বলেছিলুম না ! বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমক-হারাম, বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফল কি না ? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না ?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু কি এক রকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিন্ নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে তাই করে কি না ! কিন্তু তুইও ত স্বস্তর-বর করতে চাইলি কি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাবাসাবি করলুম, তুই একটা কথাও কার কানে তুলিলি নে।

কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অক্ষতাবে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর লিজেতে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুৎ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ভক্ত আজও যে দাদার মেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেক দিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দৃষ্টি করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিশ্চয়ে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া-সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জর আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হ'ন্‌ নে বোন, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোন মতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ে না দাদা।

কুঞ্জর অত্যন্ত বিষয়াপন্ন হইয়া বলিল, হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বল্‌চিস্‌ কি কুসুম?

না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।

কুঞ্জর রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোরা অপমান না হয় না হবে, কিন্তু আমি সহিতে পারব না। আমার প্রজা— তুই বলিস্‌ কিরে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম বালিসে মুখ লুকাইয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, অপমান ক'রচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিয়ে না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে না—বিয়ে হচ্ছে হোক।

কুঞ্জর কথা জুড় হইয়া বলিল, না।

না, কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আমার একবার করবে। আমার পক্ষে দুইই সমান। আর পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাজারিমা করে আমার সমস্ত সম্বন্ধ নষ্ট করে দিয়ে না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

হঁ, বলিয়া কুঞ্জর খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত

তোকে চিরকাল। একবার না বললে কার বাপের সাধি হাঁ বলায়। তুই কারো কথা শুনবি নে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুনতে হবে।

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুসুম বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথ্যেও নয়। তুই যখন কিছুতেই শব্দ-ধর করবি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি করে? এখন মা হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ অণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক না করুক, তুই তবে এত কাঁদিস্ কেন?

• ইহার আর জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না, কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবল বেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সে দিনের কথাগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জায় বিকারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি, ছি, মরিলেও ত এ লজ্জার মাত্রা হুইতে নিকৃতির পথ নাই। এই জন্তই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নূতন কারিগর বিবাহের উজোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না-জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া দর্শ করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিচয় ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পরিত-প্রমাণ অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্যাত্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাড়ির হঠাৎ আসিল—উঃ, এই জন্তই আমার স্বভাব-চরিত্র সবক্কে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীন, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে বোঁগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সে দিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্তর্য অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলি নিরর্থক ক্রূর কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, এবং হয় ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া বে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মৌমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসঙ্কটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সব দিক বজায় রাখিয়া বাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়াছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য আজ সে আসিবে।

দুপুর-বেলা গাড়ী এক চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডী-মন্দিরের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালার পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিত-মশায়ের দারিদ্র্য অন্যান্যোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে লোক করিয়াছিল, এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুরুষে ভালপাতা দুইয় আনিতেই দিন কাটিয়া বাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুর ছিল, শুধু ঠাকুরের আরতি শেষে

প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তিবশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অস্থগত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের সমর্থন-কবিতা পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা খুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরান্দ্র-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের স্থায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সে দিকেও খর দৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি গিয়া দাঁড়াইয়া, তারস্বরে গণিত-বিজ্ঞায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্মানে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সময়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিন্তে পারলে না?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। আমার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ বাবার পূর্বে একবার দেখতে চান। —আসি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বালাবুদ্ধকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজশিক্ষক ভূগাঙ্গসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। গোমেব-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। ভূগাঙ্গসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব ভূগিয়া বায়, সেই অতীত আত্মদেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বালাবুদ্ধটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম-এ পাশ করিয়া কলেজে শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্ভ্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে, কহিল, আমার নামা মিথ্যে কথা তুমি কথ্য, কখনো ঝড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখি নি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলো বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি ভাবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি, তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থ-ই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুকিয়া বলিল, বাক্য, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বল না, শুধু আমার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। শঠিনালখুলে, গুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-উই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম কিন্তু ছাত্রছাত্রীতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল। কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজ-কাল সবাই টের পেলোচ, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর বাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা, তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হলে

তবে গাড়ী চলে, নইলে এত বড় জড় পদার্থটাকে জন-কতক ভদ্রলোক
 গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি ক'রে একচুলও নাড়তে পারবে না। - বাকী
 তুমি—এ সব জানই, নইলে গাঁটের পরসা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না।
 আমি এই জন্তে বিয়ে পর্য্যন্ত করি নি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও
 লেখাপড়া শেখাবার ঝালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—
 শেষে একটা স্কুল দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চল
 না—ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি সয়তান
 যে, কোনো মতেই ছেলের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্মত
 নষ্ট ক'রে দিন-কতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্য্যন্ত ঘুরেছিলাম—না,
 তরুও না।

বুন্দাবনের মুখ রাজা হইয়া উঠিল। কিন্তু শাস্ত ভাবে বলিল, ছোট-
 লোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু
 তোমারও তাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত
 নষ্ট করা উচিত হয় নি।

তাঁহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিধিল। সে ভারী অপ্রতিভ
 হইয়া বলিয়া উঠিল, না না—তোমাকে—তোমাদের সে কি খ্যাতি!
 ছি ছি! তা আমি বলি নি, সে কথা নয়—কি জানো—

বুন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বল নি তা বিলকল জানি।
 কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমার সব তাঁতি কামার গয়লা
 চায়া—তাঁত বুনি, লাদল ঠেলি, গরু চরাই—আমাজোতা পরতে পাই নে,
 সরকারী আফিসের দোর-গোড়ায় যেতে পারি নে, কাজেই তোমাদের
 আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে
 ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চ-শিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্মত নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বুন্দাবন, সত্যি বলছি তাই, তোমাকে

আমি চাষা-ভূষার দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাখ কল্পবে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিজেই ত আলাদা হতে পারি নে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েছে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ জ্বাবান করি। কেশব, এই জন্তেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটে নি—আমার পাঠশালায় জুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করে নি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারি নে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশেষে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তরীম স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনত মুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আগ্রহীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বজ্রি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রদার-প্রতিপত্তি লাভ করে—বেমন আমি করেছি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসরও আমল পায় না। আমাদের বৃকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উচুতে বসে নিচে ভিক্ষা পাওয়ার গায়ে বেধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অজ্ঞায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করি নে, মতাই মদল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভালো হয়, না

হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশি বুকি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা। বন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানে। সে কথা থাক। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের অভিযোজনা কর না মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পোনের আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষা-ভূষার ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংশ্বে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-সাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্বানশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোট-লোকদের আত্মীয় হাত শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষাকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যাধা-বাণিজ্য কাজ-কর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্তে উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতগুণ না করচ তাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালা ছোটলোকের ছেলে বাবে না। ছোটলোকের শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মাজ করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা গুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বন্দাবন, বোধ করি তোমার

কথাই সত্য। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উম্মের মধ্যে বিশ্বাসের দ্রবনই না থাকে, তা হ'লে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রভাসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবি? আমরা আত্মীয় কিয়ত পন্ন? তার উপায় কি?

• বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। • আমাদের মোলো'র আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তা হলে কোন দিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় বথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল ধাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রাগা?

প্রোজুডিস নেই। খেতে পারি।

তু হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা গুলে গানের ছেনেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা—কিংবা আরও কিছু বেশি—সেটা বললে তুমি রাগ করবে।

ধষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। বাদের ভালো করবে, তাহলে দেশ থাকার ঠিক সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি বিবেচনায় ধর্ম্মে কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে গারো তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিংবা না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালার কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূঁইঠি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগারে বাড়ি হইলেও কেশব সহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উত্তরে প্রান্তরে নীমিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বৃন্দাবনকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি—বুঝলে ত ?

কেশব সলজ্জ হাস্তে বুকেচি বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে বার্থীই মাত্র তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পর ?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি নে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেসা করছি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সম্মান নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছ, কিন্তু আরও কত সহস্র গ্রাম রয়েছে, সেখানে ক'থ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। অত্যাচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয় ?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওর পোড়োর মত হ'ল। দোষের জন্ত রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তখন দুই হাত ভুলে বলবে—পণ্ডিতমশাই, মাধুও করেছে। অর্থাৎ রাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে, দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে, পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জন-কতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বুন্দাবন বিস্মিতভাবে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথটা ঠিক হ'ল না ভাই; আমার পাঠশালায় একটি ছাত্রও যদি মাসুকের মত মাসুখ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন বিজ্ঞানাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর, যেন এই ছোট পাঠশালায় একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মাসুখ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি সৰ্ত্ত আছে। কাল যাব তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি বাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অস্তুতঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। আমার প্রতি-পাচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছোল-বেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তাহলে আমি হিসেব করে দেখেছি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙলা দেশে একটি লোকও মূর্থ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা।

বুন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুইল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় ছুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ব হতে কতকণ!

কেশব কাঠল, বুন্দাবন, আজ বাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিপ্সে জবাব দেবে বল।

এ আর বেশি কথা কি কেশব?

বেশি কথাও আছে, বলছি! যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, অন্নণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বুন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটী করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা।

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনি নে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্রর বাইরে বসে বড় কান্দুচে—তার বাপ নাকি ভেদ-বমি হয়ে আর উঠতে পারছে না।

বৃন্দাবন উদ্ধ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কানিয়া উঠিল, পণ্ডিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখুচে না, কথাও বলুচে না।

বৃন্দাবন সম্মুখে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ সময়। প্রতিবৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এককণ পর্গাত টিকিয়া ছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘটী-খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙলা দেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আকন্দ-আমনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাতে তাঁহাকে ডাকিতে বাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দুটাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কলে তিনি ঠিক

জানিতেন, ধারে কারবার করিলে এ সব রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্ত বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর জীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিকপায় হইয়া হুন-জল খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সাধা রাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার রূপা প্রার্থনা করে। তারপর সকাল-বেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্ত করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্ত শিবুর সন্ত-বিধবা তাহার পায়ে কাছ কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল, তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্ন-বেলাগগরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা নাহুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় ন'স যজ্ঞচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোট ফুলাইয়া পণ্ডিতমশাই বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সন্ত-পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্ঠাও বন্নি কঁছে।

কেষ্ঠা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালা লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সন্তকে কেষ্ঠাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিত দেখিলেন, ঔষদ দিলেন, কিন্তু অবশ্য কেষ্ঠা মায়ের বুক-ফাটা কান্না,

চিকিৎসকের মর্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হইতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিস্তৃত হাত-বশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সন্ত-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতো পাইলেন কি না, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যীহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নিবিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক নয়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মর মর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ন্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারি স্রু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা স্ত্রীত গুরু মুখের সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্ন-জল দুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ির স্রুমুখ দিয়াই গ্রামের বহু পথ, তথায় বখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিষ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্ন-জল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশ-পাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে,

কিন্তু, বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্তান্ত বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারিটা পুকুরিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া দাড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে জক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আবাহ্য্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত তাহার ভাল মন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে বাইবার সময় পান না, অথচ মহামারি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধ পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সংকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইল।

গুণ্ডু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রমিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাড়িতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের স্ত্রী নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুকুরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও ছুট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। হেলের মুখের পানে চাছিলই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভয় অন্তরায় তাহাদের শিশুপুত্র মারাত্মক প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু অনিলেই চমকিয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে বার বটে কিন্তু তাহার প্রতি পক্ষপে বিচাণালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। গুণ্ডু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়।

নৃতদেহ সংকার করিয়া বরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বৃষ্টি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে, তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্বাঙ্গতঃ করণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোট-ছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা! এইবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।

বৃন্দাবন ছল ছল চক্ষে বলিল, মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুর ঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দুদিন পরে এসে তুলে নিয়ো—

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না, বৃন্দাবন। আমার শান্তিভীঠাকুর এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই মাথায় থাক। কিন্তু তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে
যাব মা ? ধর যদি—

মা একটু হাসিলেন । বলিলেন, সে ত সুসময় । তখন জানব,
আমার কাজ শেষ হয়েছে, ঠাকুর তাঁর ভার তুমি হাতে চান । তাই
হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে তোরা যাব, আমি আমার
ঠাকুরঘর নিয়ে স্বদেশে থাকতে পারব ।

জননীর অবচলিত কণ্ঠস্বরে অন্তর পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরো-
হিত হইয়া গেল । কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, তা
হলে আমারও যাওয়া হবে না । তোমার ঠাকুর আছে, আমারও না
আছেন । নিজের জন্ত আমি এতটুকু ভয় পাই নি না, শুধু চরণের মুখের
দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারি নে । কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই
হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই
নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব । এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ
দেখতে পাবে না মা ।

তারিণী মুগ্ধের ছোট্টেলে মরিয়াছে । পরদিন সকাল-বেলা
বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের
পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড়-
কাচিতেছে । কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকি আছে । বস্ত্রখণ্ড
গুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল । নিকটে আসিয়া
ক্লান্তস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়-চোপড় কি ধলে আপনি পুরে পরিষ্কার
করেন ?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার তিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না ।

বৃন্দাবন বলিল, বতটা অগ্নায় করেছেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু
আর ধোবেন না—উঠে যান ।

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকের কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখ মুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাও নি ?

বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেছি।

তারিণী চোঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে ? থাকুব বাড়লে, ধুতে যাব বদ্বিবাটীতে ? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল, কিন্তু চোঁচাচোঁচি করা, কলহ করা তাঁর স্বভাব নয় ; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শাস্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন বাই, তাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেছেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না ?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু ?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবে ন ত আমরা যাব কোথায় বলে দে ?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এত বড়

মুখ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকে নি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শাস্ত্র অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলি নি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন মাহুড় হন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আছেন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে বোম্বালমশায় আসিয়া সদরে ডাক দিকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসি এই বলিলেন, হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সং ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্ছে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ না কি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করি নি।

ভাল কর নি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মাত্র রেখে বাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের মদল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ বোম্বাল মহাশয় কষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমা স্তায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দুপাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশ বার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়া-

ছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আনি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানি নে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ ম'লে ও সব কাপড় পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ভোবা থেকে পরিকার করে আনুন, আমার পুকুরে ও সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুন্‌রিণীর জল পাহারা দিবার জন্ত পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্ত দিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাটা হইতেছে এবং তারিণী মুখ্যো কিছুতেই নিষেধ গুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কত্তা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট বড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

৩৩

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোরা মায়ের কাছে যাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আশ্বাস পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেক দিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুতঃ এ-দিকের হুস্ম বাধা-ধরা আশির্ষ্যটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্য্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কি রকম একটা ভীত সমস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখের সনেহ অমুযোগ ভিন্ন, কাহারও জুকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্ত ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাস্তু জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিবা গাড়ীতে তুলিয়া দিল এবং সজল চক্ষে ছেলের মুখচুষন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, জুঃখের ভিতরেও একটা অগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অরুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্ত বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্ত আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখিতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক করিয়া হঠাৎ সে দিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুপ্ৰম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না কাজটা ঠিক হ'ল না; অত বড় এবংজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয় ত টান্টা বুকে একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। একখানা চান্দর কাঁধে ফেলিয়া ক্রতপদে ইটিয়া

অবিলম্বে গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুজনাথের বাটীর সম্মুখে আসিয়া, বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাৱ।

সাদা পাইয়া কুসুম ঘ. হইতে দাদা বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া দীর্ঘায় অভিমানে জলিয়া উঠিয়া, চক্ষুর নিমিষে পিছাইয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। চরণ পূর্ব্বের মত মহোজ্জ্বলে চৌকামেটি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথার রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাড়াইল।

বৃন্দাবন গিজ্ঞাসা করিল, কুজদা কৈ ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয়, এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না ?

না।

কোথায় ছিলে ?

মাস-খানেক পূর্ব্ব কুসুম দাদার শান্তুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছল্য ভাবে জবাব দিল, এখানে দেখানে নানা ব্যয়গায় ছিলুম।

অন্ত বারে কুসুম সর্ব্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটা বসবার ব্যয়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন টাঙ্গন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এত বড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সে দিনের উত্তেজनावশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যে জন্তে এসেছি, বলি। আমারদের ওখানে ভারি ব্যারাম হচ্ছে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্মারামের অর্থ বুঝিল না, তাঁর অভিমানে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ বিষুথ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শাস্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি ঠিক সেই সাহসে। তা ছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেছে, আমি তোমার কাছে থাকব—নাহঁতে যাবে না মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে গুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুনমা এলে তাঁর কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় স্তান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আচ্ছা, বল্চি তা হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

খাম্বল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে কথায় আর কাজ নেই। চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়্চে ন

চরণ অল্পনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-তুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেবি করিস্ নে রে, আয়, বলিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনের আদেশ পালন করিতে শিথিল্য ছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুদ্র মুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় ক্লেশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি ?

তোমার কি এর মধ্যে অস্থখ করেছিল ?

না।

তবে, এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন ?

তা ত বলতে পারি নে। বোধ করি, ভাবনায় চিন্তায় শুকনো দেখাচ্ছে।

ভাবনা চিন্তা ! স্বামীর শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার আলাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্বীর জলিয়া উঠিল। শ্রেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলো আনাই স্থপের ! ভাবনা চিন্তা কি শুনি ?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ী প্রস্তুত হইলে চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলি নে রে ?

সে নশিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুহুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই এবং যে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখেন নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে বাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাই দিলে না, কিন্তু আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুহুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও সব আমি শুনতে চাই নে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, বলিল, তবু সেই রাগের কথা!

কুহুম, তুমি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে কমা করতে শেখাই যে সবয়ে যে বড়-শেখা এটা কেন শেখো নি। কিন্তু তুমি চরণের না, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাবার হাতে দিয়ে বিশ্বাস না বলে দ্বার হাতে হয় বল?

কুহুম হঠাৎ এ কথা বলবার খুঁজিয়া পাইল না।

গুরু ছুটা বাড়ি ফিরিবার জন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না।

কুহুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন বাই বসিয়া গায়ে গিয়া উঠিল।

কুহুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোক-গত জননীকে উদ্দেশ্য করিয়া বসিয়া উঠিল, না হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা

সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছে মা ! যদি যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছে, যদি সত্যই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছে, তবে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন ? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এখন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে ? আমার অন্তর্যামী বাহাদুরকে আমি-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সমুখে সে কথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন ? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাখিনীর মত নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত ? কিংবা সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন ? তখন কার সাধ্য বিধবার সমুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত ?

এক স্থানে, এক ভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও । হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে বাইতে দাও, না হয় ছেলে-বেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্কিঞ্চ দিনগুলি কিরাইয়া দাও, আমি নিঃশব্দ ফেলিয়া বাঁচি ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সে দিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এমন যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাওড়ীর সঙ্গে তাঁথোঁ বাইবার প্রস্তাবে সে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাইতে সম্মত হইয়াছিল । কুঞ্জর শাওড়ী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়া-ছিলেন । কিন্তু এ সব ছোট-পাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য

কুসুমের ছিল না, তাই নলডাঙ্গায় ফিরিয়া, যখন সে বাড়ি-আসিতে চাহিল এবং তিনি সাপের মত গর্জন করিয়া বসিলেন, ক্ষাপার মত কথা বলিলো না বাছা। আমাদের বড়লোকদের শত্রুর পদে পদে—তুমি সোমন্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে, আমরা সবাইয়ে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, বর-দোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় বর-দোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার বকী-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারী চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, নানাহার করিয়া নিজা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া স্বস্তুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম বর-দোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পনের পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখা মাত্রই ভাল-বসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশি হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে মা-তা বলিয়া গাণিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসুন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী বর হইতে

বাহির হইয়াই স্তম্ভক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে কটাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা ?

মা অদূরে ভাঁড়ারের স্নমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র প্রশ্নোত্তর প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথা র্ছিরা লা ? মাহুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে ?

মোম্বা উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, ছঃধী মাহুষকে দিয়ে দাসী-বৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না ?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাগন-গুণ্ডো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির স্তায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া, তা যাক ! বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-ঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানান্তিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্ত তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন :

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবছি ঠাকুরঝি !

কুসুম চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দুদিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনেমনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোন্টো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এখন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁয়ত্রিশ কি পঁয়ষট্টি, তাহা ধরিবার যো ছিল না। কেই মেয়ে দেয় নাই

বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসিমায়ের প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, প্রত্যহ যখন তখন মাসিমা বলিয়া হাজির হইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুঠুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, বাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার ঝাড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন আর কিছু না বলিয়া, কোন মতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসির সহিত কথা কহিতেছে। কুঠুম আকণ্ঠে বোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা গোবর্দ্ধনদাদা! আগে কোন কালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সময় হয়ে উঠেছে কেন বল ত? বাড়ির ভেতর আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।

গোবর্দ্ধন জানিত না, সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের ভায়ে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু না অগ্নিসূতি হইয়া চোখ রাঙা করিয়া চোঁচাইয়া উঠিলেন, আগে ওর ইচ্ছে হয় নি, তাই আসে নি, এখন ইচ্ছে হয়েছে আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করি নে। আমার নিজের জন্তও তত বলি নে মা, কিন্তু আমার নন্দ রয়েছে, সে পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্ত কি আমার আপনার বোনুপা ভাইপোরা পর হয়ে বাঁধে, না বাড়ি ঢুকবে না?

তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পরদার বিবি, না কারু সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্য্যস্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দুদিন স্নান মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে সে ভালবাসে নাই, এখন বাসিয়াছে। বরং এ ধরণের ভালবাসা, ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী বাইবার জন্ত উত্তত হইয়া গোবর্দ্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্দ্ধনদাদা, ভারি লজ্জার কথা ভাই, মুখে ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেছি। দাদার মত আমতে পার ত এসো, না হলে তোমার অন্তঃস্থ দুঃখ আছে—সে দুঃখ নাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি। বাসিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েছে রে গোবর্দ্ধন!

গোবর্দ্ধন মুখ রাখা করিয়া বলিল, তোমার দিকি মাসি, আনি জানি নে—কোন শালা কোণের ভিতর—মাইরি খুঁচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞাস্ করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ত-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্ছি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে শুক হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া চাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বো, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিকতে দেবে না?

আগে কাপড় ছাড়, তারপর বল্‌চি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আঁঠু বস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া দিয়া কহিল, অন্তায় আমি কোন মতেই সহিতে পারি নে ঠাকুরকি, তা তোমার জন্তই হোক, আর আমার জন্তই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মংলব আমি টের পেয়েছি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিল, মংলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা নিয়ে কথা ক'য়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন ?

কুসুম প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখুচি হবে, কপালে সজোরে আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কঁাদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সম্মুখে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আশ্তে আশ্তে বলিল, বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বল নি। রাগ ক'রো না, ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও কম দোষ নয় ঠাকুরকি।

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলে-বেলার ঘটনা সব শুনেছ ত?

শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত ছেনে শুনে এ'স্ত্রী মায়াবী তুমি—সিঁদুর পা না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীকে বধ কর না, এ কপালের দোষ না তোমার নিজের দোষ ভাই? তুমি না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে ত? তুমিই বল, কোন্‌ সধবা কবে, বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বো, কিন্তু আমি সিঁদুর নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে গুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিশ্বয়ে অধীর হইয়া গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি এরা চেয়ে বেশি প্রশ্নাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোন নি, ঐ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দজ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্তই জানেন, তিনি বলেন নি? আমি মনে করেছি, তুমি সমস্তই জেনে শুনেই এখানে এসেচ, তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেই জন্তে কোন কথা বলি নি, চুপ করেই আছি। বরং তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর আমার রাগ পর্যাস্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছুর গুনি নি বো, কি হয়েছিল বুঝি?

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুরজানায়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের যখন সখ্য হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন তোমার দাদাই অত হাদ্যামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে! আমার শাণ্ডীর কথা, তোমার কথা, ওদের কথা, সমস্তই ওঠে—তখন নন্দজ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তার মেয়ের সখ্য ভেঙে যায়। তার পরে ঠাকুরবাড়ির বড়বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনি মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অমুখতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ সকল কাণ্ড হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দজ্যাঠাকে ছকুম দেন, যে এ কাণ্ড কারয়েছিল, তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয়, কল্লিবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয় নি।

কুসুম আশঙ্কায় নিখাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয় নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কি না ভাই। অপর কেউ হয় ত চক্ষু-লজ্জাতেও এত গুণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দিক তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কৃতিবদল দেন নি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে বেবে!

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশি কিছু নেই। আমার শাণ্ডী-ঠাকুরণ আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে দুঃখে লজ্জায় অভিমানে তোমাকে নিয়ে এই খানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু হতে পায় নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান নি?—আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্তে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সে দিন হয় ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

হ্যাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সে দিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্ব্বাহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাও নি, না কথা কও নি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরী আর কোন প্রশ্ন করিল না। গন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শাঁথের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁইল, তুমি একটু বসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিবে একটা প্রদীপ জ্বলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ বখা স্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যিই কাজটা ভাল কর নি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানি নে, কিন্তু মনে বর্ণন জানো তিনি কে, আর তুমি কে তখন তাঁর অঙ্গমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয় নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেছি, আমার তেমন অবস্থা হ'লে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকথত দিয়ে যেতে হবে, আমি ভাই যেতুম!

কুসুম পূর্ববৎ থাকিয়াই এবার অশ্রুতে বলিল, বোঁ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিছু না। গেলে, স্বামী পাবো, ছেলে পড়বো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাব কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন,

তুমি বাও, আমিও বহুতম, তুমি বাও—জোর করে থাকলে কি কল্পতেন তিনি ?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্ত, সান্ত্বনা দিবার জন্ত বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে! এমন বিপদের দিনে আমি-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন ?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বই কি! অবশ্য তারা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দালা, এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রতাহ দশদিনেরজন ক'রে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ে না ঠাকুরঝি।

কুসুম তাহার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিই নি—আমি কিছু—তিনি নি বৌদি—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুন্লে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো ?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দি মা দাড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই তীব্র স্নেহের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকুরঝিকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে শুনি ?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিক স্বরে কহিল, বেশ তুমি, ভেতরে এসো বল্চি। তোমার কিন্তু ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মংলব দেয় না, আমিও দিচ্ছি নে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কু-মংলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাথে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণে!

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুহুমের হাতের চিম্টি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেই জন্যই কালামুখীকে বল্ছিলাম, যা, শ্বশুরঘর কস্ গে যা, থাকিস্ নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাশুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসির প্রকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, বলি, কোন্ শ্বশুরঘরে কালামুখীকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলামো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে শুনে তাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান করো না। শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্দ্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নির্ভর স্পষ্ট ইঙ্গিতে বাকদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মার নামে এত বড় অপবাদ দিস্!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এই যে সত্যি কথা। মাইরি বলছি মা, তোমাদের মত হু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ি মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক্ চেষ্টামেচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার

হুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার বা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ে; তোমার দ্বিবি করে বলছি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের স্তম্ভীক শরের মুখে, মা বুঝিলেন, বুদ্ধ এ ভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কঠোর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা, তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস্ নে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়া কঠোর করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুক পাণ্ডুর মুখখানি উচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনে শুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করছি—আচ্ছা এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী জটপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদনকে কর্তব্যে বিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারি নে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসে। রা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরুচে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রজনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান খাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন দিদিঠাকরুণ, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন ?

সে ত জানি নে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অল্প দিন-এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে আর একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুস্থখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ বেলায় মত যা হোক মুখে লাগে—তে আর দাঁড়া ঠাকুর-বাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, বাটাঁর বৌ যখন, তখন বাটাঁর মতই অশৌচ মানিতে হবে। যাই হোক, মাগি দোষে গুণে ভাল মানুষই ছিল। সে দিন আমার ব্রজেশ্বরীর সৎকার করতে এসে কত কথা!

আজ ছদিন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েছে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্র ছেলে, আজ সকালে তারও দ্বার ভেদ-বমি হয়েছে!

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেচিস্ রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা! কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানি নে, আমি ঘর দোর পুকুর বাগান সমস্ত খুঁজেচি কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—তবে সে আর নেই। মার গঞ্জন সইতে না পেয়ে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে বাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কৌচাচ খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন করে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাই নে, বলিয়া একটান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আনার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ-বাড়ি ঢুকব না—ওহু কুসুম রে—

তাহার শাপড়ী কিছুই জানিত না, চীৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েছে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এে ছিলাম রে—ওরে আমার কি হল রে !

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ ! ছুঁম্ নি আমাকে ।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কঁাদলে আর টেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে ? আমি বলচি, সে কক্ষণ ভুবে মরে নি :

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, এক ভাবেই কঁাদিতে লাগিল । এই বোনটিকে সে অনেক দুঃখ-কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থ-ই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত । পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃত দেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

ব্রজেশ্বরী স্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, ভূমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরে নি ।

কুঞ্জ সজল চক্ষে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল ।

তাহার স্ত্রী আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন ।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না । চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে যেতে পারত না ।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পার্বত ভুল ! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে । যে যাই হোক, চরণের জন্তও ত সে যেতে পারে !

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না ?

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল ক'রে পৌছতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ি, নইলে বাড়ল সাত সমুদ্র তের নদী পারে হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞাস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

তললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চক্কে বিনাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল স্বস্তরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরীওয়াল কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছয় দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোন দিন এ অধিকার স্মৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সে দিন তারিণী মুণ্ডজের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিমত্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধবনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। বাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসী নতাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিয়াণে মারিভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড় রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে

সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফারমে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা দাসী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুল্চেন না ?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন ?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্ছি নে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো !

কেহ সাড়া দিল না। বাড়ি-শুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেষ্টাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার সাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যেন মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্ন প্রায়। ঘরময় বিষচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উত্তিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেয়ের পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্রোধ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাগে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘৃণা ভাগাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। দারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, একপ

শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সঙ্ক করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্ত একবার প্রাণপণ বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ে কাছ গড়াইয়া পড়িল। তাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকর জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কর্তরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া নানাদানী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারো কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌছিল।

তখন তুলসী-বাগমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ, গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর মলিন শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুগ্ধিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্ত যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ী, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশুপক্ষী—যে সমস্ত লইয়া ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিশ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফাল্ ফাল্ করিয়া চাহিয়াছিল।

— কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ীর বদলে মাল্‌ঘের কঁাধে অমন করিয়া মুড়িমুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষন্ন মূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোন দিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্ব্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদ্বাস উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ কয়দিন প্রতাহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া ধসিতেন, কত রকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুমিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়িক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভয়পোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিতে না। শেষ পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জ্ঞান হাঁপাইয়া মরিয়া লাগিল! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের স্বর্ঘ্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপস্থত হইত না, এমন অসময়ে কুহুমেরও হয় ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন

মা কে কবে পায় ? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—যাবার সময় কথাটি পর্য্যন্ত কহিয়া গেলেন না । এমনি করিয়া তাহার বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা, যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কঁাদ কঁাদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে ? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কি রকম হয়ে গেছে !

তাহার কথাগুলো লাঠির নত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েছে চরণের ?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট ! হয় নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকছেন ।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে স্রমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কঁাদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে !

দাসী ধমকু দিয়া উঠিল—ছিঃ ওকি কথা দাদা ?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেক দিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল ।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা ।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইচ্ছা হইলে বৃন্দাবন মনে মনে ভারি আশ্রয় বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ ।

কখন আসবেন তিনি ?

সে ত জানি নে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি।

চরণ খুসি হইল। সেই দিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আনিয়া লইয়া যাইবার জন্ত কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুই দিন বাকি আছে, সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদ-বসি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নিজ্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবসির চেহারায় বিস্থচিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের স্রুগুথে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দাও ; বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নিচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ষট্টি-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান ! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক্, কিন্তু সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধুলো দিন, একবার তাকে দেখুন ! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে !

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখযো এই ডাক্তারবাবুরই মামা ? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান ! সে সময়ে মনে হয় নি, এই পা দুটেই মাথায় ধব্বতে হবে !

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বল্চি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করি নি ; বা ঠাকুরকে নিষেধ করেছিলাম, সমস্ত গ্রামের ভালর অজ্ঞাই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অত্যাচার !

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্তায় বই কি ! মামা ভারি অন্তায় করেছে। আমি ডাক্তার আমি জানি নে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দুছত্তর ইংরিজী পড়ে, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ ! এত বড় পুকুরে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয় ! আমি কচি খোকা ! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও ? এত দর্প ! এত অহঙ্কার ! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্ত বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মান্চি, পায়ের ধূলা মাথায় নিচি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন ! শিশুর প্রাণ বাঁচান। একশ টাকা দেব—দুশ টাকা, পাঁচশ টাকা—যা চান দেব ডাক্তারবাবু, চলুন—ওষুধ দিন।

পাঁচশ টাকা।

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন—না বাপু, তারিগামামা অল্পমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি ! টাকা নেব ওষুধ দেব। কিন্তু সে ত হবার ঘো নেই। তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু ? কাল আমার না মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু ? তখন তোমাকে নিরস্ত আমার কাষ চলবে না। বরং এক কার্য কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে আমার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধর গে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—দাঃপাল টাটকা ভাল ভাল ওষুধ এনেচি—দিয়েই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহবল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও দেরি ক'রো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাষ নেই—যাও ছুটে যাও।

বৃন্দাবন উর্দ্ধ্বাসে কান্ডিতে কান্ডিতে তারিণীকৃত্রীচরণে আসিয়া পড়িল।
তারিণী লাখি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্মো-আফিক না করে জলগ্রহণ করি নে। কেমন, ফল কি না! নির্বংশ হলি কি না!

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কান্ডিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, ছি ছি, এমন অধর্মের কাষ ক'রো না। বা হবার হয়েছে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে ওষুধ দিক্।

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—তুই থান্ মাণী—পুরুষমাহুষের কথায় কথা ক'স্ নে।

তিনি খতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্ছি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাণ্ডরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না—তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষালমশায় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত গুনিয়া হঠাৎ বলিলেন, শাস্ত্রে আছে, কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পুড়ে—কেমন হে তারিণী, সে দিন বলি নি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারি বাড় বেড়েছে। যখন ও জ্ঞামার কথা

মান্লে না, তখনি জানি, ওর উপর বিধি বাম ! আর রক্ষে নেই ! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী ?

তারিণী মনে মনে অগ্রসর হইয়া কহিল, আর আমি ! সে দিন পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে-হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ । খুড়ো, আলিহ না করে জলগ্রহণ করি নে ! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, এখনও জোয়ার ভাঁটা খেলছে ! বলিয়া ব্যাধ বেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া, নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আশ্বাসন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই এক-মাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল !

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল । প্রাণের দারে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বিনিয়োগ, আর একটি কথাও বলিল না । নিদারুণ অভ্রান ও অকৃতন মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র বিরোধ বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্মতকে জাগাইয়া দিল । সমস্ত গ্রামের মঙ্গল কামনার ফলে এই দুই স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আলিহের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাকবিতণ্ডার শেষে বীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বেগ শান্ত মুখে পীড়িত সন্তানের শব্দ্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ।

কেশব তখন আশুন আনিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাবতপ্ত নরকৃত্যের সহিত প্রাণপণে যুক্তিতেছিল । বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতায় চলুন । যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব, না পাই, এই বাওয়াই শেষ বাওয়া ।

উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্ভের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে বৃন্দাবন ! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখো ভাই ! বলিয়া ক্ষতপদে বাহির হইয়া গেল ।

কেশব চলিয়া গেলে, চরণ পিতাকে কাঁছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল । সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোন দিনই জিদ্ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাৰ্য হইয়া উঠিল । ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে বাইবার উৎসাহীংকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল । এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল । ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু ; বরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গভীর করিয়া একধারে বসিলেন । কেশব সভয়ে তাহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন ।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শাস্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে ; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন । যে বাপ, বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ হয় ডাক্তারবাবু ।

• পিতার এত বড় বৈষ্য ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল । তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার নুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল ।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম । পাশেই ঠাকুর

ঘর, আবশ্যক হ'লে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হ'বার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ব্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সে দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে দিন তাহার কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যে দিন কুঞ্জমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়াছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে। ভগবান, আমি সে নালিশ জানাতে আসি নি, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর, বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? পিতৃহরণে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কি জ্ঞা? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের, বহু বার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত, গাছের একটি গুঁড়ু পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র এক কোঁটা চরণে মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জ্ঞাত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মঙ্গলের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিন্তা প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জমিল,

কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাকে একটি কাষ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল !

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম বক্সা শাস্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু মেঘ-মুক্ত নির্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে-আড়ালে বসিয়া আছে !

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহার করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার মোল আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি ? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া বৃত্তাশ্রয়াশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না ; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হইত। আজ সমস্ত দিন, যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে বাবার জন্য কঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল ! কিন্তু এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্তর চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল-বেলা কেহই যখন কুহুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্য্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে আর লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুহুম মুখ তুলিয়া বলিল, ঠাঁদের আস্তে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে বেক্রপ অবিলম্বে দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ আশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চরণের কুহুম দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিনয় হইল না। কেশব সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জীবকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা। যারা কথার কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্ম, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোজোর।

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে শুক হইয়া বসিয়াছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া কণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আশানে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব উঃ—বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগ্দিদের দুই-তিনটি ছেলে-নয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন এম'কিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল,

বৃন্দাবন নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেছে, এখন বোধ করি, তার জবাব পেলাম—সংসারে একছলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জালা যে, মহা শত্রুর জন্তও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এরও দাম আছে কেশব, এখন যেন টের পাচ্চি, খুব বড় রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিকন্তর মুখে চাহিয়া রহিল; বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, এই জালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখছি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে—চরণ বেঁচে থাকতে ত একটা দিনও এমন হয় নি।

কেশব অবনত মুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালায় পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোট ভাই, জলপান ও জল লইয়া 'বাই'তেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী, কোথায় যাচ্ছিস্ রে?

বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পণ্ডিতমশাই।

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই এক সঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম মেখে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ বুক জুড়িয়ে গেল রে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বুঝি মত্টিয়ে হারামাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরই চরণ আমার নিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাঁকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারি রাগ করবে।

ওঃ—তা বটে! আমি চরণকে পুড়িয়ে আস্চি যে! বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে তদৃশ হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উর্দ্ধমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েচ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না। আজ যেমন দেখতে দিলে, এমনি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের মুখ দেখতে পাই। এমনি বুকে নেবার ভয় যেন চিরদিন দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয় ত জোচোর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করি নি যে, ভগবান এত বড় নও আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্বতভাবে গজিয়া উঠিল। জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তা'র প-তপের তেজে; জিজ্ঞেস কর গে, আর এক জোচোরকে, সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোথরো মাপের খোলোবকে লাটির

আবাত করে লাভ নেই, পচা বোলের দুর্গন্ধের অপবাদ ছুঁধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং ভাখো।

কেশব সেই সব কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এত বড় দণ্ড কেন ?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার ক'রে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাই নে। এ জীবনের শ্রবণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গোরবের ক্রেশ। কোন বড় জিনিষই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে বসে ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের ঘায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটিনাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বে দিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস, এ পাড়ায় আর একটা বড় রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থ

ব্যয় করিলে এমন কুপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, বাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে ; উপরন্তু অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাঁক আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুসী হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাব্দের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এইট ক'রো ভাই, বিবাক্ত জল খেয়ে 'আমার চরণের বন্ধু-বান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও বখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোন দিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মালুম হয়েছে। আমি সেই দিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সৰ্কদাই উপস্থিত থাকিতেন, নিরতিশয় স্নেহ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সাবুনা দেবার কথা খুঁজে পাই নে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মহত্তর। অক্ষম অপাবগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মুহু কণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সম্ভব ত আমার নেই মাষ্টারমশাই? বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে গেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনীর দ্বায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সৰ্কদা ত অলকট মোচনের জন্ত দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি কার?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্তে দেখানো চাঁড়ানো ভিক্ষার বুলি দেখাইয়া বলিল,

বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টি ভিক্ষার অভাব হবে না মাষ্টারমশাই, এইতেই আমার বাকি দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া, সম্পত্তি আনার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিবে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও আত্মের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাই তিনি কুশ্রমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্বরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা সত্য, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন!

বৃন্দাবন মুখ নিচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করবার আশ্রুততা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যে দিকে চোখ পড়েছে, সেই দিকেই তার ছোট হাত ছুঁখনির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করুন মাষ্টারমশাই, আমি মাহুষ, মাহুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষ মুখে নৌন হইয়া রহিলেন।

যে ভাস্কর চরণের শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মধ্যাহ্নিক বটনা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেই দিন সকালে বিনা আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত ভুলিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু

কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্ত সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়া এই পাঠশালা নিয়ে সারা জীবন থাকবে ?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা ।

ডাক্তার দ্বিধা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসরি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিত কি এক ? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি ?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই । টাকা বোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ !

নয় মানি ! কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয় !
উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে হে !

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয় ? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নর-নারী হত্যা হয়, সে কি কারো কোন দিন চোখে পড়ে ? আপনারা সবাই আমাদের এমন নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা এত নিরুপায় হয়ে মরি না ! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু বারা আপনাদের মুখের অন্ন, রণের বসন ঘোঁষায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এই সব গ্রামেই বাস । তানিকেই দুপায়ে মাড়িয়ে বেঁটলে বেঁটলে আপনাদের ওপরে ওঠার দাঁড়ি তৈরি হয় । সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম-এ পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরে দাঁড়িয়েচে ।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া

উঠিল, বুনাবন, মাল্লব হবার কত বড় সুযোগই না আমাদের নিয়ে গেলে ! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না !

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই ছুটি বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায়, বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন বুনাবন ভিক্ষার বুলিমাত্র সংগ্রহ করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে কোন স্থানে নিজের কর্ম-ক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বুনাবন সখ্যত হয় নাই। কারণ সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উত্তোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই-চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দূকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

গুণ কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যে দিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেই দিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জন্মিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এবং না লইয়াই নিজের নৈরাশ্রিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তিনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যাত্রা কার্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েক বার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সেদিন কালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই ; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে বাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল ।

দাসী তৎক্ষণাৎ কিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি বাবেন না ।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার ঘো নেই, সে কথা বলে দিলে না কেন ?

দাসী কহিল, যোমা নিজেই সমস্ত জানেন ।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে ?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল । ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ চুকিতে সাহস করিল না, দ্রব্য ঠেলিয়া ভিতরে চাহিলই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল । দন্তগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—চোখে তাহার উৎকট, ক্ষিপ্ত চাহনি । আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক, কত শিথ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিলে, বৃন্দাবন এই তাঁহা প্রথম দেখিয়া সত্যে পিছাইয়া দাঁড়াইল ।

‘অসাবধানে কপাটের বড়া নাড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো ।’

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল । হয় ত সে প্রকৃতির দৈব, উন্নত নারী কি হইবে মন্দেই করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল ।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, তাই আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আঁদীর ছই পায়ে মাপা মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল ।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখখানে চাহিয়া বড় কর্ণ বর্ধে বলিল, সবাই বলে তুমি সহিতে পেরেচ, কিন্তু আমার বুকের ভেতর বানি নিশি হু হু করে জলে যাচ্ছে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

হৃৎনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদেব বহি নিবিয়া গেল, সে হাঃ ধাঃ তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে তুচ্ছিত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম! তাই তোমাকেও এ পথে ডাকচ। সে তোমার নরে নি, হারায় নি, শুধু বুকের ভেতরে—একবার ভালবাসে চেয়ে দেখতে নিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে আমাদের চরণও তাহাদের সঙ্গে আছে।

এক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। কণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন নতয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুবাস্তব। আমি যাব।

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্ত নিঃকরতে পারি, কিন্তু তোমার জন্ত ত পারি নি! তা ছাড়া তুমি ইট কি করে

